ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যে নারী-নিপীড়ন প্রসঙ্গ

চন্দন আনোয়ার*

আশির দশক থেকে সামাজিক অবক্ষয় ও মৌলবাদের উত্থানের কারণে আমাদের ব্রাত্যনারীরাই ফের নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের ভয়ানক অবিচার, অনাচার, বৈষম্য ও লাম্পট্যের সাথে মৌলবাদের ও সন্ত্রাসবাদের আক্রমণে নারী একটি সংকটময় সময় অতিক্রম করে। কোথাও নারীর আশ্রয় ও নিরাপত্তা নেই। নারীর নিয়তি *চালচিত্রের খুঁটিনাটি* গ্রন্থের "ঐখানের কথা" গল্পের নববিবাহিতা মেয়েটির মতো। বাস উল্টে খাদে পড়ে গেলে বাঁচার জন্য মেয়েটি তার স্বামীর গলা আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর স্বামী লাথি মেরে তাকে আলাদা করে নিজে ওপরে উঠে আসে। পরে অবশ্য মেয়েটিও বাঁচে এবং স্বামীর হাত ধরেই যায়। কিন্তু 'সমস্ত জীবন ধরে মেয়েটির হাত শুধু ফস্কেই যাবে কেবলি আলগা হবে, শেষে সে তলিয়ে যাবে।'[১]

কোনো বিশেষ তত্ত্বের কারণে নয় বা নারীবাদী কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে নয়, সামগ্রিক বাস্তবতার অনুসরণ করেন বলেই হাসান আজিজুল হকের গল্পে নারী চরিত্রের প্রাধান্য। তাঁর কোনো গল্প নারীবাদী গল্প হয়ে যায়নি। *মা-মেয়ের সংসার* গ্রন্থের "জননী" ও "মা-মেয়ের সংসার" এবং *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের "ফুলি, বাঘ ও শিয়াল" এই তিনটি গল্পের এবং *সাবিত্রী উপাখ্যান* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নারী। এরা প্রত্যেকেই পুরুষের লাম্পট্য ও ধর্ষণের শিকার হয়।

জননী এক দরিদ্র কুমারী মায়ের গল্প। তার একের পর এক গর্ভধারণের ট্র্যাজেডি গল্পের বিষয়। গল্পের কথক শহরের মধ্যবিত্ত সমাজের একজন। তার ফ্লাটবাড়ির কাজের মেয়ে চৌদ্দ-পনেরো বছরের কুমারী আয়েশা এক সন্তানের মা। অবশ্য, মেয়েটির অসাধারণ দুটি চোখ, মধু রঙের ত্বক, প্রতিমার মতো নিষ্কলুষ মুখ তার কোনো চিহ্ন বহন করে না। মহাভারতের সত্যবতীর মতো মেয়েটির কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি। কিন্তু মেয়েটি আবারো গর্ভধারণ করলে সংকট তৈরি হয়। কথকের জন্য এই কুমারী মাকে আশ্রয় দেবার অর্থই হচ্ছে কুৎসিত বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু তিনি পালাতে চান না। মেয়েটির সতেজ জরায়ু থেকে যে সুস্থ্য নিষ্পাপ শিশুটি জন্ম নিবে, যে শিশুটির জন্য সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা করছে, তার জন্মের সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব বর্তায় তার ওপরেই। এছাড়া, যে পুরুষ জন্তুটি মেয়েটির গর্ভদাতা, কথক সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একজন। কিন্তু তিনি মধ্যবিত্তের সীমানার বাইরে বেরোতে পারেননি। সম্ভ্রম রক্ষার্থে শেষপর্যন্ত মেয়েটিকে বিদায় জানাতে হয়।

কুমারী মায়ের গর্ভগৃহ একমুহূর্তের জন্যও খালি থাকে না, 'তার জনহীন জন্মদ্বার সে সম্পূর্ণ খোলা রেখেছে।' লোকের চোখ আড়াল করে কথক মেয়েটিকে কাছে ডেকে সন্তানের খবর জানতে চেয়েছিল, মেয়েটি নিস্পৃহ কণ্ঠে জানায় সন্তান নেই। মেয়েটি সন্তান কোথায় রাখে, বিক্রি করে দেয়, নাকি গর্ভধারণের বিনিময়ে অর্থ পায়, নাকি দেবতাদের শাপমুক্ত করতে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

শিয়াল-কুকুরের খাদ্যে পরিণত করে, নাকি ডাস্টবিনে বা অন্য কোথাও ফেলে রাখে কারো দয়ার অপেক্ষায়, লেখক এই বিষয়টি খোলাসা করেননি।

নারীত্ব ও মাতৃত্বের এই চরম অপমান কথকের জন্যে মর্মান্তিক কষ্টের। নিজের কুমারী কন্যাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন। শেষবারের মতো যখন কথক আয়েশাকে দেখেন, তখন সে পুরোদস্তুর পাগল। একের পর এক সন্তানের জন্ম দিয়ে এই কুমারী মায়ের শরীর বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো খাঁজকাটা, ভাঁজ করা ও তীব্র ধারালো হয়ে ওঠে। কপালের বিশাল গর্তের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে তার অসাধারণ চোখ। প্রতিমার মতো সুডৌল মুখ শুকিয়ে কাঠ। মাতৃহীন এই কিশোরী মেয়ে আমাদের সমাজের কিছু নষ্ট ও ইতর মানুষের লালসার শিকার। বাস্তবে তারা জন্তু-দানোর চেয়েও অধম ও অবিবেচক। তবে, ওরা আয়েশার অনৈতিক মাতৃত্ব তার পবিত্রতাকে নষ্ট করতে পারে না। বরং পুরুষসমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণার চোখে তাকিয়েছে এই কুমারী মা। 'পৃথিবীকে সে দেবে অমূল্য উপহার, গর্বে তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে তার বুক, অবজ্ঞার চোখে সে চেয়ে আছে মানুষের ইতর সংসারের দিকে।'[২]

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিও কুমারী মায়ের মতো বারবার আক্রমণে বিধ্বস্ত, ভঙ্গুর, সর্বনাশের প্রান্তে পৌঁছে যায়। ঠিক কুমারী মায়ের অবৈধ সন্তান ধারণের মতো একের পর এক অবৈধ সরকার ও স্বৈরশাসককে গর্ভে ধারণ করে দেশ, গণতন্ত্র ও সংবিধান এখন অপুষ্ট, অসুস্থ ও বিকলাঙ্গতার শিকার।

পুরুষের লাম্পট্য, ধর্ষণ, গর্ভধারণ, ফতোয়া, প্রকৃতির খেয়ালিপনা— এসব পরিচিত অনুষঙ্গই "মা-মেয়ের সংসার" গল্পের বিষয়। কিন্তু লেখকের নির্লিপ্ততা, সুগভীর জীবনবোধ, নির্মোহ প্রকাশভঙ্গি, প্রত্যাখ্যানের সাহসী পদক্ষেপের কারণে গল্পটি সমগ্র বাংলা গল্পসাহিত্যে অনন্য এক সৃষ্টি হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী খালপাড়ের একটি কুঁড়েঘরে অভিভাবকহীন দুই নারী মা ও মেয়ের বসবাস। প্রকৃতির সাথে তাদের একধরনের সখ্য তৈরি হয়। মা-মেয়ে দুজনেই খুব সুন্দরী। এটিও প্রকৃতির এক খেয়াল। পাটকাঠির বেড়া, ছনের ছাউনির কুঁড়েঘরটি সুন্দরবনের বাঘ-শেয়ালের থাবার মধ্যে, মা-মেয়ে নানা কাজে ওদের সীমানায় প্রবেশ করে কিন্তু অদৃশ্য কারণে অথবা পারস্পরিক বোঝাপড়ার কারণে কেউ কারো শিকারে পরিণত হয় না।

মায়ের আছে মেয়ে, মেয়ের আছে মা। সমাজ, ধর্ম, আল্লাহ, বেহেস্ত তাদের প্রয়োজন নেই, সমাজ-ধর্মের কাছে তারা যায় না। বরং সমাজ তাদের কাছে আসে; হয় রাতের আঁধারে, না হয় দিনের আলোয়; হয় ধর্ষণ করতে, না হয় শাসাতে। ইরাবান বসুরায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য:

> তাদের দরকার নেই, কিন্তু বাইরের জনসমাজের দরকার আছে। দরকার আছে তাদের রূপযৌবনকে চেটে খাবার, দরকার আছে জেনা করেছে বলে তাদের শাসানোর। তারা সমাজের বাইরে, তাদের মতো করে বাঁচতে চায়, কিন্তু তাদের প্রান্তিকতা সমাজ মনে করে প্রয়োজনীয় আবর্জনা মাত্র, ব্যবহার করে যাকে ছুঁড়ে ফেলা যায়।[৩]

এক সন্ধ্যায় মেয়ে প্রকৃতির কাজে বাইরে গেলে শেয়ালের মতো ওঁত পেতে থাকা চার লম্পট মেয়েকে তুলে নিয়ে মুখে গামছা ঢুকিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে অজ্ঞান অবস্থায়। পরে

তারা মাকেও মেয়ের মতো ধর্ষণ করে দুজনের রাতের খাবার চারজনে ভাগ করে খেয়ে উল্লাস করতে করতে চলে যায়। মেয়েকে ধর্ষণের বর্ণনা:

> ত্রাসে দম আটকে এলেও সে চেয়ে রইলো, ছোরা বেঁধানোর তীব্র যন্ত্রণায় একবার ককিয়ে উঠলো মেয়ে। গলার প্রায় ভিতর পর্যন্ত কাপড় গোঁজা থাকায় আওয়াজটা গোঙানির বেশি কিছু হলো না। চারজনে চারবার দখল করলো তাকে। চরজনের শেষ হয়ে যাবার পর প্রথমজন আর একবার। মেয়ের তাতে কিছুই যায় আসে না, তার জ্ঞান ছিল না। লাল রক্তমাখা বিছানায় সে শুয়ে রইল।[৪]

প্রকৃতির নিয়মেই মা-মেয়ের ভিতরের বিষাক্ত বীর্য মাংসপিণ্ডতে রূপান্তরিত হয়। মা-মেয়ের রক্ত-মাংস খেয়ে বেড়ে উঠছে নষ্ট সমাজের নষ্ট বীজ। সকাল সন্ধ্যায় তারা মাটি, কাঁচা তেঁতুল, তেঁতুল গাছের পাতা চিবায়। আতঙ্কিত মা-মেয়ে এই পরিস্থিতি থেকে পালাতে পথ খোঁজে, কিন্তু সে পথ পায় না। আত্মহত্যার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কারণ তাদের আল্লাহ নেই, সুতরাং আল্লার প্রতিনিধি আজরাইলও আসবে না জান কবচে। তখনি জঙ্গল থেকে বাঘের গর্জন কানে আসে, বাঘিনীকে খুঁজে মরছে। মেয়ে সকালে উঠে সেই বাঘের পদচিহ্ন ধরে জঙ্গলে ঢুকে একনিষ্ঠ হয়ে খোঁজে বাঘ। বাঘটাকে খুঁজে না পেয়ে দারুণ হতাশা ও ক্লান্তি নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। কিন্তু বাঘরূপী সমাজপতিরা ঠিক সময়ে হাজির হয় শাসনের দণ্ড ও ফতোয়া নিয়ে। এবার, ভণ্ড সমাজশাসক ও ধর্মবেত্তাদের সামনে অসুরনাশিনী দুর্গার মতো মূর্তিমান রুদ্ররূপ নিয়ে দাঁড়ায় মা।

> কি করতি হবে তাই শুনি—মা শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে।
> ওসব ফালায়া দাও পেটের থে, না হলি সোমাজে থাকতি পারবা না। জেনা করলে সোমাজে থাকা যায় না।
> জেনা কেডা করিছে?
> তোমরা, তোমরা মা-বেটি।
> কার সাথে করিছি ?
> তার আমরা কি জানি। করিছ তাই জানি। এতদিন লুকায়ে রাখিছিলে, এখন তো পেট বারোয়ে পড়িছে। আগে কি আইচি কোনোদিন বলতি? এখন দেহিচি, এখন আইছি। আল্লার আইন মানতি হবে সগ্‌গলের।
> আল্লার সঙ্গে তোমাগো কথা হয়।
> হ্যাঁ, হয়।
> সে বিটা কি কয়?
> খবরদার ছিনাল মাগী, মুখ সামলে কথা কবি। সে বিটা কি কয় জানা নেই! কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতি পাথর ছুঁড়ে খতম করতি হবি তোদের।
> সেই বেবস্থাই কর গে তোমরা। তোমাদের পোলাগুলারেও নিয়া আসবা। ওদের মাটিতে পোঁতবা মাথা থিকে কোমর ইস্তক। আল্লা নেই, তাই আল্লার কথা কচ্ছো। থাকলি এতক্ষণে ঠাঠায় পুড়ে কেলায়া থাকতা।
> সোমাজে থাকতি পারবা না কলাম।
> সোমাজ নাই আমার, খালডার ওপারেই জঙ্গল।
> বলতে বলতেই জং-ধরা দাখানা হাতে তুলে নিল। এখন আর উঠোনে দিনের আলো নেই। জয়ঢাকের মতো মায়ের বিশাল পেট, বর্তুলাকার কঠিন দুটি স্তন। অপার্থিব মুখশ্রী। দা হাতে উঠোনে নাচতে থাকে মা। মুখের কোণ দিয়ে গেঁজলা উঠে যায়।[৫]

সমাজ, সমাজশাসন, সমাজপতি, ধর্ম এসবের বিরুদ্ধে বিরাট প্রত্যয় ও শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে মা। নষ্ট, বিবেকবর্জিত, ভণ্ড, লাম্পট্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সমাজপতিদের রায়কে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধ করে। প্রচলিত মূল্যবোধের কোনো কিছুকেই রক্ষা করেনি বা স্বীকৃতি দেয়নি মা। তারা সমাজ থেকে পালিয়ে যায়নি। তারপরেও অনেক কিছুকেই মেনে নিতে হয়। যেমন, সমাজকে প্রত্যাখ্যান করেও রাতের অন্ধকারে ধর্ষিত হয়।

মা-মেয়ের ক্ষুধার্ত শরীর থেকে রক্ত-মাংস খেয়ে পুষ্ট হচ্ছে পেটের দানো। দোজখের সেপাই হয়ে বেড়ে উঠছে। যন্ত্রণাদগ্ধ মেয়ে চিৎকার করে, শান্ত মা মেয়েকে প্রবোধ দেয়, এরকম চিৎকার করে লাভ নেই। আল্লাহ, বেহেস্ত-দোজখ বলে কিছু নেই। মাওলানা, ধনী, বড়লোক, মাতাল, জাউরা, বজ্জাত শ্রেণির মানুষের যেমন সম্পদ আছে, তেমনি আল্লাহ আছে। আল্লাহ ওদের কাজেই ব্যস্ত। না হলে অসহায় মা-মেয়েকে চার পাষণ্ড ধর্ষণের সময় আল্লাহ কীভাবে নীরব থাকে? আবার, তাঁর বিধান নিয়ে বিচার করতে আসে সেই ধর্ষকদের পিতারা।

জীবন-মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় মা-মেয়েকে, কিন্তু তারাও ফুল ফোটাবার ক্ষমতা রাখে। মায়ের ফুল অকালে ঝরে গেলেও মেয়ের পেটে সেই ফুল ফোটার অপেক্ষায়। সেই ফুল ফোটার দিনে সৃষ্টি হয় প্রকৃতির ভয়ানক তাণ্ডব, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের জলে ভেসে যায় অসংখ্য লাশ ও মৃত পশু-পাখি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যায় মা-মেয়ে, নবজাতক শিশু, তাদের কুঁড়েঘর। ভাসমান লাশের স্রোতে চারজন ধর্ষকের লাশও ভেসে যেতে দেখে মা-মেয়ে। তাদের একজনের সন্তান রয়ে গেল। প্রকৃতির এই এক নির্মম প্রতিশোধ। আল্লাহ মা-মেয়েকে রক্ষা করেনি, তবে প্রকৃতির নিয়মেই ধর্ষকদের বিচার হয়। এর সঙ্গে হেঁয়ালিও যোগ হয় যখন শিশুটি চিৎকার করে তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাবি করে। শিশুটির অস্তিত্ব টিকে থাকার মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তর চারদশকে মুক্তিযুদ্ধের অপশক্তির পুনরুত্থানের রহস্য নিহিত। ধর্ষিতা মা-মেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতীক চরিত্র। শিশুটি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির অপভবিষ্যতের প্রতীক।

মা-মেয়ের মতোই "ফুলি, বাঘ ও শিয়াল" গল্পের মা ও মেয়ে ফুলির জীবন-বাস্তবতা। তবে, মা-মেয়ের মতো এই পরিবারটি সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। ফুলি বাঁধের উপর দিয়ে নিয়মিত বাজারে গিয়ে টেলিভিশন দেখে, হিন্দি গান শোনে। কাপড়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, হোটেল এসব চেনে। ন্যাংটা মেয়েমানুষ ও মানুষ উলঙ্গ হলে কেমন জন্তুর মতো দেখায় সেটিও জানে। শুধু নিজের বাড়ন্ত শরীরটিই তার কাছে ভীষণ রহস্য। নিজের শরীর সম্পর্কে বাড়ন্ত বালিকার এই উচ্ছ্বাস ও উদ্বেগ প্রকৃতিজাত। ফুলি প্রকৃতির সরল ও সুন্দর দিকটিই দেখেছে। তাই, গুগলি-কাঁকড়া-শামুক-চিংড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে তিন দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হলে ফুলির ভাবনায় ঢুকে না যে, কেন তারা এই আচরণ করছে ওর সাথে।

> কি করতে চায় ওরা কাকে বলবে? মাকে বলি, মা, মাগো এ দ্যাখ পাজামা খুলিছে আমার ওরা। এই দ্যাখ, ফোরকের মধ্যি হাত দিয়া ছিঁড়ি মাগো বুকে কামড় দিছে, একটা বুক ছিঁড়ি নেছে। ওমা, ওদের কি করিছি আমি? গলায় যে নখ ডুবায়ে দিইছে, উঃ মা, ছুরি মারিছে আমারে, ছুরি মারিছে...।[৬]

মা-মেয়েকে ধর্ষণ করে যে দুর্বৃত্তরা, তাদেরই সাঙ্গপাঙ্গরা ফুলির সর্বনাশ করে। এখানেও প্রকৃতির শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ফুলির ধর্ষকদের প্রকৃতির সন্তান ডোরাকাটা বাঘ নৃশংসভাবে হত্যা করে নিজের খাদ্যে পরিণত করে। মা-মেয়ের মতো বলাৎকারের শিকার ফুলিও বাংলাদেশেরই প্রতীক চরিত্র। ফুলির মতোই নতুন দেশ বাংলাদেশ একাধিকবার সেনাশাসক ও স্বৈরশাসকের বলাৎকারের শিকার হয়। যৌবনাগমনের পূর্বেই ফুলির সকল স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দুর্বৃত্তরা। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আগেই গণতন্ত্র ও সংবিধানকে বিনষ্টের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

এক যুবতীর উপরে একাধিক পুরুষের বলাৎকারের ঘটনা, ঘটনার সূত্রে মামলা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাসান আজিজুল হকের *সাবিত্রী উপাখ্যান* উপন্যাসের বিষয়। তাঁর জন্মস্থান বর্ধমানে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৮ সালে। ফ্লাশব্যাক পদ্ধতিতে উপন্যাসের শুরুতেই লেখক তুলে ধরেন ১৬ বছর বয়সে ধর্ষিতা সাবিত্রীর পঁচাশি বছর বয়সের জরতী বেলার মর্মান্তিক জীবনচিত্র। সে এখন বাড়ির পচে-ধসে যাওয়া বাতিল জিনিসপত্রের সাথে অন্ধকার একটি ঘরের অধিবাসী। জীর্ণ-শীর্ণ-ক্ষয়িত ও দুর্গন্ধজারিত সাবিত্রীর শরীরে অবশিষ্ট বলে কিছু নেই। খাওয়া, ঘুম, জাগা, দেখা— এসব অনুভূতির ঊর্ধ্বে উঠে গেছে তার শরীর। ঘোলাটে সাদা চোখে আলো নেই কিন্তু জেগে আছে আশ্চর্য এক জিজ্ঞাসা নিয়ে।

> বুড়ি নিয়ম মাফিক জিজ্ঞাসা, এখন চাঁদের পক্ষ চলছে, না অমাবশ্যার পক্ষ চলছে? আলোর পনেরো দিন, না অন্ধকারের পনেরো দিন? অন্ধকারের পক্ষ শুনলেই নিশ্চিত। চাঁদের আজ দশ দিন, তেরো দিন; পূর্ণিমার আর দুদিন বাকি—শুনলেই মার্বেল দুটো একদম নিভে আসে। পূর্ণিমা কেন হয়, পূর্ণিমা কেন চিরদিনের জন্য বন্ধ হয় না। তেমন সময় কোনোদিন আসবে না, শুধুই অমাবস্যা, আঁধার! [৭]

আলো আর অন্ধকারের প্রভেদ জানতে চাওয়াটা ছাড়া সাবিত্রীর পঁচাশি বছরের জীবনের সবই বিস্মৃতি ও অন্ধকার। সাবিত্রীর অন্ধকার পৃথিবী প্রার্থনার কারণ জানা বা রহস্য ভেদ করার সামর্থ্য আছে এমন কেউ বেঁচে নেই। তাই, সর্বজ্ঞ লেখক নিজেই সাবিত্রীর উপাখ্যানের বর্ণনাদাতা। বিষয়ের সত্যতা রক্ষার্থে লেখক আখ্যানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা, মন্তব্য এবং সিদ্ধান্ত পর্যন্ত দেন। এছাড়া, প্রকৃত মামলার প্রচুর সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুবাদ করে ঢুকিয়েছেন কাহিনীর বর্ণনা থামিয়ে।

ব্রাহ্মণ-কন্যা সাবিত্রীর জন্ম, মায়ের মৃত্যু, সাত বছর বয়সে বিয়ে, পিতার গৌরীদান, শ্বশুরবাড়িতে দু-একদিন জন্য আসা-যাওয়া, পিতার মৃত্যু ইত্যাদির অতি অল্প বর্ণনা দিয়ে লেখক প্রবেশ করেন মূল গল্পাংশে। সাবিত্রী অসামান্য সুন্দরী। তার প্রথম ঋতুস্রাবের ঘটনা ঘটে বিয়ের অনেক পরে। শরীরের এই বিস্ময়কর রূপান্তর সাবিত্রীর জন্য নতুন এক প্রয়োজনকেও ডেকে আনে। কী করতে হবে এবং এবার স্বামীর কাছে গেলে কী হতে পারে— হাড়িদিদির কাছে শিখে নেয়। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার মতো এই পনেরোটি বছর ধরে মেলতে মেলতে সাবিত্রীর শরীর এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দুর্দান্ত ক্ষুধা শরীরে জেগে উঠেছে কিন্তু স্বামী দুকড়ি নির্বিকার। সে এর কোনো খবরই রাখে না। এমনকি, নির্জন দুপুরে সাবিত্রীর নিবিড় সান্নিধ্যেও নির্বিকার দুকড়ি।

> গা ছমছম করে উঠেছিল তার। বুকের ভেতর ধকধক করে কি যেন চলছিল। পেরাণটাই বোধ হয়। ছোট লাইনের রেল ইঞ্জিনের মতো ঝকঝক শব্দ ওঠে আর খানিকটা করে লোহার রেললাইন যেনো উধাও হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ধকধক করে চলে আর খানিকটা করে দুপুরের সময় গিলে খায়। টাকার কথা বলায় হাফ ছেড়ে বাঁচল সাবিত্রী।[৮]

সাবিত্রীর অনন্ত বন্ধকের দশ টাকা নিয়ে কলকাতা যাবার আগে এই ঘটনা। অল্প কদিন পরে, দুকড়ি কলকাতা থেকে ১০টাকা ও বাড়ি ফেরার দিনক্ষণ জানিয়ে চিঠি পাঠালে ষোড়শী সাবিত্রীর স্বামী-মিলনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের সুযোগ তৈরি হয়। ভরা পূর্ণিমায় প্রথম স্বামী-মিলনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলা সাবিত্রী বন্ধকি অনন্ত ফিরিয়ে আনতে গিয়ে তিন লম্পট দ্বারা অপহরণের শিকার হয়। অপহৃতা সাবিত্রীকে কাঁধে নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার জঙ্গলাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে তিন লম্পট দুর্গাপদ, বটকৃষ্ণ ও সবুর উপস্থিত হয় অজয়ের পাড়ে। ষোড়শী সাবিত্রীর সমস্ত প্রার্থনা ও অনুরোধকে উপেক্ষা করে প্রথম নারীত্বের স্বাদ নেয় দলের ষণ্ডা দুর্গাপদ। সাবিত্রীর সতীপর্দা ছেদের রক্ত শুষে নেয় অজয়পাড়ের শুষ্ক বালু। প্রথম ধর্ষণের দৃশ্যপট:

> দুর্গাপদ এদের দিকে তাকিয়ে খুব শাদা চোখে বলে, এ তো এমনি হবে না দেখছি। অনন্ত-পরা নতুন বউ হয়েছে ছুঁড়ি। সে হাত বাড়িয়ে সাবিত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বালির ওপর শুয়ে পড়ল। বটা, হাত দুটো চেপে ধর, সবুর, তুই ধর পা দুটো। আগে ধর তো, তারপর দেখছি। ঘাড়ে কাজ এসে গেল। ওদের খিদেটিদে মাথায় উঠল। সাবিত্রী এখন শুধুই মাথা নাড়তে পারে, মাথার পেছনটা ঠুকতে পারে বালির ওপর আর একটানা না, না, আমার সব্বোনাশ কোরো না, কোরো না। ভীষণ বিরক্ত দুর্গাদাস বটার দিকে চেয়ে বলল, মুখটা চেপে ধরতে পারছিস না! দুই হাতের ওপর বোস্, মুখটা চেপে ধর। খুব ধীরে ধীরে কাজ এগুতে লাগল। দুর্গাপদ সাবিত্রীকে ভালো করে শুইয়ে দিচ্ছে। নিজের হাতে সাবিত্রীর পা দুটোকে শান্তভাবে বিছিয়ে দিচ্ছে। তারপর নাভীর উপর ধীরে ধীরে চেপে বসছে, সবুর আস্তে আস্তে পা দুটি হাঁটু অব্দি গুটিয়ে দিচ্ছে, শাড়িটা এতক্ষণে বাতাসে উড়ে গিয়ে একটা মাটির ঢিবিতে আটকে রক্ত-পতাকার মতো পতপত করে উড়ছে। দুর্গাপদ সযত্নে শুয়ে পড়ল সাবিত্রীর ওপর। ইস্পাতের একটা বল্লম স্বচ্ছ আচ্ছাদনটুকু ছিঁড়ে মাখনের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছুল। সাবিত্রী আর একবার মাত্র চিৎকার করে উঠল। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ, সংক্ষিপ্ত মৃত্যু-চিৎকার এই একটাই।[৯]

সমস্ত আখ্যান জুড়ে সাবিত্রীর প্রতিবাদের একমাত্র ভাষা-ই নীরবতা। সাবিত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে লম্পটদের অসহায়ত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শারীরিক শুচিতা নষ্ট করে বরং লম্পটরাই কঠিন ভয়ের মুখে পড়ে। তাই, সাবিত্রীকে হত্যা করে বা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে অথবা পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে দিয়ে অপকর্মকে ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথবা হলেও সাবিত্রী যেভাবে শিরদাঁড়া শক্ত করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাকে আর কোনোভাবেই লুকানোর উপায় ছিল না। এরই মধ্যে প্রত্যেকে দ্বিতীয়বার ধর্ষণ করে সাবিত্রীকে। এবার আর সাবিত্রীর উপরে কোনো শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। বরং 'ধরিত্রী হয়ে গিয়েছে সে'।

সাবিত্রীর শরীর দখল করে আছে লম্পটেরা, আর তার জেগে থাকা মন দখল করে আছে চণ্ডিদাস, রজকিনী, রাধা, কৃষ্ণ এবং হাড়িদিদি। পচনশীল আবর্জনাতুল্য পোশাকি শরীর জীর্ণ-শীর্ণ-বিদীর্ণ হলেও সাবিত্রীর মনের শুচিতা নষ্ট হচ্ছে না। সে নিজেকে রজকিনী ও

রাধার স্থানে প্রতিস্থাপন করে। তার কাছে ভগবানের লীলা আর মানুষের লীলা এক সূত্রে গাঁথা। বরং ভগবানের চেয়ে মানুষের লীলাই বড় লীলা। কারণ, পাপ-পুণ্য সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্ষমতা শুধু মানুষের আছে, ভগবানের নেই। কল্পনায় হাড়িদিদিকে সে বলে, 'জীবজন্তুর কাছে তিনি তত যেতে চান না, তিনি বড্ড মানুষের গা-লাগা। ভগোবানের খুব নোভ মানুষের মতো হবার।' (পৃ. ৪৬) এই মানবিক অহংকার সাবিত্রীর প্রাণশক্তি। তাই, শরীরের পাপ ও আত্মার পবিত্রতাকে আলাদা করে নিতে পারে সহজে। দ্বিতীয়বার তিনজনের পালাক্রমে ধর্ষণের শেষে সাবিত্রী যখন উঠে দাঁড়ায়, তখন তার অশুচি শরীর নয়, পবিত্র আত্মা উঠে দাঁড়ায়। তার চৈতন্যজগতে নিজের শরীর সৎকারহীন একটি শবদেহ মাত্র। এরপরে, সাবিত্রী নয়, সাবিত্রীর শবদেহ-ই একাধিক পুরুষ দ্বারা বহুবার ধর্ষিত হয়। একবার শুধু প্রচণ্ড শক্তিতে কেঁপে উঠেছিল শবদেহ, যখন টগর বষ্টুমি শাঁখা ভেঙে বালা খুলে সিঁদুর মুছে গোসল করিয়ে মুসলমান বানিয়েছিল। এই একবারই মাত্র সাবিত্রী আত্মজয়ের কঠিন দুর্গ ছেড়ে টগর বষ্টুমিকে অভিশাপ করে: 'একি করছ, একি করছ, আমার কি সব্বোনাশ করছ? আমি বামনের ঘরের মেয়ে এই কদিন বে হয়েছে। তোমার যে নরকে জায়গা হবে না।'[১০]

উপন্যাসের আখ্যানজুড়ে যতবার এবং যতজন পুরুষ দ্বারা ধর্ষিত হয় সাবিত্রী, তার মধ্যে শুধু প্রথমবার ধর্ষণের সময় প্রথম পুরুষ দুর্গার কাছে বাঁচার আর্তি জানিয়েছিল এবং শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয়বার এবং দ্বিতীয় পুরুষের ধর্ষণের সময় থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে লম্পটদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে। বস্তুত, ধর্ষিতা সাবিত্রীর শরীরের সমস্ত মানবিক অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়। তার শরীরের সমস্ত সাধ-আকাঙ্ক্ষা-ক্ষুধা-তৃষ্ণা ধ্বংস করে দিয়েছে কতিপয় লম্পট পুরুষ। নশ্বর শরীরের আর কোনো প্রয়োজন নেই অনশ্বর সাবিত্রীর কাছে। সে মনোজগতের দরজা-জানালা প্রায় বন্ধ রাখে। কিন্তু তার নীরব ক্রোধ, প্রতিবাদ ও ঘৃণাই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। ধর্ষণোত্তর সাবিত্রী মা দুর্গার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। লম্পটেরা তার চোখের দিকে তাকানোর সাহস পায় না। 'মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সাবিত্রী, তিনদিকে তারা তিনজন, তিনটে ষণ্ডা শুয়োর। একমাত্র সাবিত্রীরই মাথা উঁচু, বাকিরা মাথা নামিয়ে আছে।'[১১]

সাবিত্রীর নীরব প্রতিবাদের মুখে ধর্ষকরা সর্বদাই তটস্থ ও পলায়নপর। দুর্গা এবং বটা কৌশলে সরে পড়লে সাবিত্রীর দায় পড়ে একা সবুরের ঘাড়ে। সবুর নিজের স্ত্রী পরিচয়ে সাবিত্রীকে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে এবং এক বাড়ি থেকে অন্য আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সাবিত্রীকে লুকানোর মতো কোনো জায়গা পায় না। সর্বোচ্চ সাতদিনের বেশি কোথাও আশ্রয় জোটে না। অবশেষে, মামলা হলে এবং হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা অবশ্যম্ভাবী হলে সবুর সাবিত্রীকে নিয়ে ওঠে কলকাতার মুসাফিরখানায়। এর ফাঁকে, রক্ষাকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসা এলাকার বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৈয়দ সাহেব সাবিত্রীকে একবার ধর্ষণ করে। তারপরেও দাঙ্গা ঠেকানো যায়নি। পাল্টাপাল্টি দুইপক্ষের লাশ পড়ে। মুসাফিরখানায় কিছুদিন কাটিয়ে বন্ধু হুদার বাসায় ওঠে। তামাটে রঙের, দীর্ঘ ও পেটানো শরীর, গলাবসা ও কটা চোখের পুরুষ হুদার পাশবিক পেষণের কষ্ট সাবিত্রীর আগের যে কোনো পুরুষের ধর্ষণের কষ্টকে তুচ্ছ করে দেয়। এরপর, সাবিত্রীর কলকাতা ও হুদার গ্রামের বাড়ি বগুড়ার

দিনগুলোর বর্ণনা এক। দিনের পর দিন এতবার এত পুরুষের দ্বারা সাবিত্রী ধর্ষিত হয় যে, একই বর্ণনার ক্লান্তি থেকে বাধ্য হয়ে সরে আসেন লেখক। দুই বন্ধুতে ভাগাভাগি করে রাতভর ধর্ষণ করে। সাবিত্রীর প্রতি রাত একই রাত। দুই বন্ধুর বাইরে ওদের আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ মাওলা বখ্‌শ ধর্ষণ করে একবার। এভাবে, বর্ধমানে ফেরার আগে পর্যন্ত যেখানে নিয়ে গেছে সেখানেই সাবিত্রী ধর্ষিত হয়।

পৃথিবীর ফাঁদে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিমানুষের জীবনের অনুসন্ধানকেই উপন্যাসের প্রধান বিষয় বলে মনে করেন মিলান কুন্ডেরা।[১২] পুরুষশাসিত পঙ্কিল সমাজের ফাঁদে পড়া সাবিত্রীর জীবনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন লেখক। অবশ্য, ফাঁদে সাবিত্রী একা পড়েনি, তাকে যারা ধর্ষণ করে তারা প্রত্যেকেই ফাঁদে পড়ে। সেই ফাঁদে জড়িয়ে যায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় এবং শেষে রাষ্ট্রের বিচার ও আইন। সাবিত্রীর ব্যক্তিসত্তা ও অজেয় অপরিমেয় আত্মশক্তির অন্বেষণ-ই উপন্যাসের মূলবিষয়। আত্ম-অন্বেষণের পথে অবিচল সাবিত্রী প্রথম ধর্ষণ এবং ধর্মচ্যুতির মুহূর্তটি ছাড়া মুক্তির জন্য আর কোনো আবেদন রাখেনি। এই নারীর পরাজয়ের জন্য সামান্যতম সম্ভাবনা বা সুযোগ তৈরি করেননি লেখক। বারবার ধর্ষণের ভেতর যে আত্মশক্তির জাগরণ, সেখানে নিজেকে ভাঙচুরের মধ্যদিয়ে নিজেকেই নতুনভাবে চিনে নেয়ার এক কঠিন পরীক্ষা মাত্র।

তথ্যসূচি:

---

১ হাসান আজিজুল হক, "ঐখানের কথা" *চালচিত্রের খুঁটিনাটি* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ৩৩

২ হাসান আজিজুল হক, "জননী", *মা-মেয়ের সংসার* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ৫৪

৩ ইরাবান বসুরায়, "মা-মেয়ের সংসার : প্রত্যাখ্যানের গল্প," *গল্পকথা*, হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ২০১২, রাজশাহী, পৃ. ৬৮

৪ হাসান আজিজুল হক, "মা-মেয়ের সংসার", *মা-মেয়ের সংসার*, *পৃ. ৫৮*

৫ তদেব, পৃ. ৬১-৬২

৬ হাসান আজিজুল হক, "ফুলি, বাঘ ও শিয়াল", *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* (ঢাকা: সময়, ২০০৭), পৃ. ২৯

৭ হাসান আজিজুল হক, *সাবিত্রী উপাখ্যান* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ৯-১০

৮ *তদেব*, পৃ. ২০

৯ *তদেব*, পৃ. ৩৫

১০ *তদেব*, পৃ. ৭৬

১১ *তদেব*, পৃ. ৩৯

১২ মিলান কুন্ডেরা, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, অনুবাদ: সঞ্জীবন সরকার (ঢাকা: সন্দেশ, ২০১২), পৃ. ২৫